সম্ভাবনা

(নাটক)

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

প্রকাশক—শ্রীঅনঙ্গকুমার ভট্টাচার্য্য

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ—১৩৫০ বাং

প্রাপ্তিস্থান—
মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা,
ও প্রকাশক, শ্রীহট্ট।

প্রিণ্টার :—
শ্রীবিনয় ভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
শক্তি প্রেস, শ্রীহট্ট।

এক টাকা।

শ্রীযুক্ত রঞ্জিৎ কুমার দত্তকে—

নাটকখানা আপনি অভিনয়ের জন্য লিখিয়েছিলেন। চার দিনের ভিতর কত তাড়াতাড়ি করে এখানা আপনাকে লিখে দিতে হয়েছিল সে দিনগুলোর কথা আজ মনে পড়ছে। একেবারে কিছু না বদলে আজ এখানা ছাপছি। বইখানায় আপনার দাবীর সঙ্গে জগতের দাবী আজ মিলিয়ে দিলুম।

১লা বৈশাখ,
১৩৫০ বাং।

গুণমুগ্ধ—
শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

চরিত্র পরিচয়

জগদীশ বাবু—ধনী, বয়স পঞ্চাশের মত।

ইন্দিরা— ঐ স্ত্রী

সর্বাণী— ঐ মেয়ে

রঞ্জন— ঐ ছেলে

জয়ন্তী— রঞ্জনের স্ত্রী

প্রমোদ } — রঞ্জনের বন্ধু
কিশোর }

বিজয়— কবি, কর্মী।

অনন্ত— যুগ নায়ক।

হারু— জগদীশ বাবুর পুরাতন ভৃত্য

পিওন—

সম্ভাবনা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রঞ্জনের বাহিরের ঘর।

সময়—সন্ধ্যা।

কিশোর—কি হে রঞ্জন, কি এত ভাবছো—

রঞ্জন—কি ভাবছি বল তো!

প্রমোদ—বৌদির কথা—না রঞ্জন দা,—

রঞ্জন—মাঝে মাঝে ও ভাবিয়ে তুলে বই কি, এমন গম্ভীর মেয়ে যে কিছুই বুঝা যায় না।

কিশোর—ওটা নূতনের সঙ্কোচ।

রঞ্জন—মোটে না, সঙ্কোচ বলে কিছু ওর নেই; শুধু যে কি কিছুই বোঝা যায় না। কি যে ভাবে সেই জানে,—আমি নিজেই যেন সহজ হ'তে পারছিনে—। আমাদের স্ত্রীরা মোটে আগের কালের মত নয়।

প্রমোদ—জয়ন্তী বৌদি কোথায় রঞ্জনদা?

রঞ্জন—ওদের কিসের এক সভা আছে না,—তাই গেছে। সভা, সমিতি, কাজ,—ওগুলোকে মোটে ভাল মনে নিতে পারছিনা কিশোর! [মৃদুহাসি]

কিশোর—যাওয়া ভাল। বিয়ের পর তো বেরোন না বললেই চলে। কি ভাবছিলে বললে না?

রঞ্জন—ভাবছিলাম,—বাবার চিঠি পেয়েছি। তিনি আসবেন লিখেছেন, কেন যে আসবেন তাই শুধু ভাবছি—

কিশোর—কক্ষনো আসবেন না—

রঞ্জন—তাইতো জানতুম—জানতুম তিনি সহরকে ঘৃণা করেন! আজ হঠাৎ—তা' থাক, আপাততঃ ব্যবসার চিন্তাই করি।

প্রমোদ—সে তো তোমরা শোনবে না, আমাকে বলবে পাগল! আমি কিন্তু জানি একদিন তোমরা সবাই ব্যবসায়ে নামবে, আর সেটা চালাবে এই প্রমোদ-চন্দ্রই! জানো, আজ বাংগালির এ অধঃপতন কেন? আচার্য রায় বলেছেন—

কিশোর—থাম্ প্রমোদ, রাখ দেখি তোর আচার্য রায়কে—[প্রমোদ কিশোরের মুখে তাকিয়ে থামলো, কিশোর রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো] তোমাকে বুঝা যায় না রঞ্জন, মনে হয় কি বলতে যেন কি বলচো—বুঝা যায় না ঠাট্টা না সত্য। রোজই

তুমি নূতন ফন্দী আঁট কিন্তু কাজে পরিণত করবার ইচ্ছা তো দেখিনে—

রঞ্জন—[কিশোরের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে তারপর প্রমোদকে বলতে লাগলো] প্রমোদ তোর ফিশারীর প্ল্যানটা কিন্তু ছিল ভাল।

প্রমোদ—এত কম টাকায় আর কোন ব্যবসা হয় না কি? হাজার দু'টাকা ইনভেষ্ট করে বছরে ছ' হাজার টাকা লাভ! ধরোনা প্রথম বছর জলাটায় বাঁধ দেওয়া আর চারা মাছেরই তো যা' খরচ,—আচ্ছা আমি তোমাদেরে হিসেবটা দিই—

[পকেট হ'তে নোটবুক ও কলম গ্রহণ]

রঞ্জন—সে তো সোজা হিসাব, অনেকবার শোনা! টাকাটা খসাতে পালে না?

প্রমোদ—যোটে না! এমন লাভের ব্যবসা—কত বুঝালুম,—বাবা হদ্দ কৃপণ। তার উপর ওই কিশোর—

কিশোর—এ কিন্তু মিছে দোষ দেওয়া প্রমোদ! আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বললুম—কি জানি,—অতোশত বুঝিনা—।

প্রমোদ—এই দেখ রঞ্জনদা, বলি গাধা, অতো যে বুঝালুম একটু বুঝলেই তো পারতিস! না,—তোদের মথায় কিছু নেই—[হতাশ ভাব]।

রঞ্জন—[তাড়াতাড়ি] বিজয়ের যে দেখাই নেই, ও আবার কোথায় গেল ?

প্রমোদ—বাবার টাকা আছে, ঘরে বসে হয়তো কবিতা লিখছে—

কিশোর—এও কিন্তু মিছে কথা প্রমোদ, সেদিন সে আমাকে কত দুঃখ করে বললে,—'আলোক ও আভাস'—তার এতো ভাল কবিতার বই—ওই টাকার অভাবেই ছাপতে পারছে না।

রঞ্জন—ভারি মিশুক ওই বিজয়, জগতে সবাইকে এতো আপনার করে নিতে আর কাউকে দেখিনি! কিছুই যেন তার চাই না! জয়ন্তী তো তাকে পেয়েই বেঁচে গেছে—যেন আপনার ছোট ভাই—এমনি!

প্রমোদ—আর যা' সুন্দর গায়!

কিশোর—ভাল ও ঠিকই—ভয়ানক খেয়ালী! [অবজ্ঞাপূর্ণ নীরস মুখভঙ্গি] এই তো আসবার পথে দেখে এলুম ব্যস্ত হয়ে ছুটছে, সর্বাণী বলে একটি মেয়ে আছে না,— তারই আত্মীয়া, তাদের পাশের বাসায় থাকে,—ওর মার অসুখ—বললে!

রঞ্জন—সর্বাণী মেয়েটা কে হে ?

প্রমোদ—জানো না রঞ্জনদা, বিজয়দের পাশের বাসায় থাকে, হট্ হট্ করে কলেজে যায়,—ভারি দেমাক! একদিন রাস্তায় যা কট্মট্ করে আমার দিকে চাইলে—

রঞ্জন—কিন্তু বিজয় তো ওরই প্রশংসা করে, বলে,—জয়ন্তীর সঙ্গে নাকি ভারি মিল—একেবারে চলায় ফেরায়—সবকিছুতে—

প্রমোদ—দেমাক এই যা রঞ্জন দা, নইলে মেয়েটা ভারি সুন্দর—চমৎকার !

কিশোর—সুন্দর না কচু ! আমি কি দেখিনি বলতে চাস্ ! এতো বড়ো বড়ো চোখ যে গিলে খাচ্ছে মনে হয়—তাতে আবার যা গায়ের রঙ ! [বিকৃত মুখভঙ্গি]

প্রমোদ—[রোষে] দেখ্ কিশোর, সুন্দরকে কুৎসিৎ বলে লাভ কিছু নেই ! তোর ব্যথাটা কোথায় বাজে সে কি আর আমি জানি না বলতে চাস্ ? [চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি]

রঞ্জন—তোরা থাম্‌তো দেখি ! প্রমোদ তোর ওই হট্ হট্ করে চলা আর কট্‌মট্ করে চাওয়া সুন্দরী মেয়েটাকে আমি দেখবোই ! হ্যাঁ, তাইতো ভাবছি। জয়ন্তীর সঙ্গে মিলটা কোথায় ? বিজয়কে ধরতে হবে—

কিশোর—[ঘড়ি দেখে] প্রমোদ, যাবিনে ? [অর্থপূর্ণ দৃষ্টি]

প্রমোদ—তাই তো—চল্-চল্ ! আজ আসি রঞ্জনদা, বড্ড কাজ।—

[দু'জন বেরিয়ে গেল]

রঞ্জন—[অন্যমনস্ক ভাবে] অদ্ভুত এই মেয়ের জাত ; তাই ওদেরে দেখতে এতো আরাম লাগে—সর্বানীকে—

[রঞ্জন সচকিত হ'য়ে উঠলো, জয়ন্তী এসে ঘরে ঢুকল]

জয়ন্তী, এলে ?— [সামনের চেয়ার দেখিয়ে] বসো ! বাবার চিঠি এসেছে,—দেখেছো ?

জয়ন্তী—[মাথা নেড়ে] হ্যাঁ—

রঞ্জন—লিখেছেন তিনি আসছেন, অর্থ কিছু বুঝতে পারলুম না।

জয়ন্তী,—অর্থ তো খুব স্পষ্ট ; তিনি আসছেন লিখেছেন এতে আর বুঝবার কি আছে ?

রঞ্জন—না জয়ন্তী, অর্থটা মোটে স্পষ্ট নয়,—এ যে অসম্ভব—অসম্ভব জয়ন্তী—ছেলেবেলা থেকে এই জেনে এসেছি—অসম্ভব।

জয়ন্তী—কিন্তু অসম্ভব ও তো সম্ভব হয়—তুমি যে উত্তেজিত হয়ে পড়লে—

রঞ্জন—[একটু ভাবলো, মাথা নেড়ে বলতে লাগলো] না,—হয় না জয়ন্তী, একটা কিছু নিশ্চয় ঘটেছে ! [জয়ন্তীর দিকে একটু তাকিয়ে দেখলো] একটা কথা বলবে জয়ন্তী ?

জয়ন্তী—কি ?

রঞ্জন—বলবে, কি তুমি এতো ভাবো ? সত্যি কিছুই আমি ভেবে পাইনে। আমার মনে হয় তোমার মনে গোপনে যেন কি একটা ঘটছে,—বুঝতে পারনে কি ? শুধু আমি পড়ে আছি বাইরে, এ যেন আমার

নাগালের ভিতর নয়—তুমি যেন সুখী নও। কি ভাবো বলবে জয়ন্তী! [চোখে আবেগ আকুতি]

জয়ন্তী—[আস্বস্তি গোপন করে, মৃদু হেসে] ভারি সুন্দর একটি গান মনে আসছে, বিজয়ের কথা—সুর—চমৎকার! শোনবে? [রঞ্জনের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল, উঠতে উঠতে বলতে লাগলো] বিজয় আজ আসে নি?

রঞ্জন—না!

জয়ন্তী—ও কেমন করে আমার ছোট ভাই হয়ে গেল,—অবাক হয়ে ভাবি! সবারই ও ছোট,—ছোট ভাই! বড় ভাল ছেলে ওই বিজয়! ভারি হিংসা হয় আমার যখন তাকে আর কারো সঙ্গে দেখি!—[জোরে হেসে উঠলো, রঞ্জনের মুখেও হাসি]।

[দু'জন বসলো অর্গেনের সামনে পাশাপাশি, জয়ন্তী সুর দিল]।

তোমায় আমি যতই ভাবি চিনি
চেনা আমার হয় না যে—হয় না যে!
ধরার হাটে থামলো বিকি কিনি
নামলো না মোর বোঝা তাহার মাঝে।
দুঃখ অভাব ঘুচবে না কি প্রভু,
সাঙ্গ যখন সবই হলো তবু।

শোনবে না কি ক্ষণেক তুমি থামি'
আমার মনে কি গান তোমার বাজে,
চুপি চুপি আঁধার হ'তে নামি'
আসবে না মোর প্রাণে—আমার কাজে।

রঞ্জন—কিসের দুঃখ জয়ন্তী, কিসের অভাব তোমার—

জয়ন্তী—[মৃদু হেসে] ও তো গান, আচ্ছা আসছি—

[জয়ন্তী বেরিয়ে গেল]।

রঞ্জন—বললে না জয়ন্তী! আমি বোকা নই, আমি জানি এ শুধু গানই নয়! এ শুধু সেবক সঙ্ঘও নয়—তারো বেশি। স্বামীদেরও আজ বদলাবার দিন এসেছে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ছোট্ট ঘর।

সময়—রাত আটটা।

[মা ও মেয়ে। মা মৃত্যু শয্যায়, বয়স ঠিক বুঝা যায় না, পরণে সধবার বেশ মেয়ে সর্বাণী পার্শ্বে]

মা—সর্বাণী?

সর্বাণী—কেন মা?

মা—সে এলো না?

সর্বানী—কে মা?

মা—অনন্ত। পাঁচ বছর সে চলে গেছে, কতো দিন আমি ভেবেছি সে আসছে! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রত্যাশায় কেটে গেল,—সে এলো না! সে তো মিথ্যা বলে না,—যাবার সময় বলে গেল, ঠিক সময়ে কোলের ছেলে কোলে ফিরে আসবো মা—দেখো,—ঠিক সময়ে আমাকে হাজির পাবে,—কই এলো না তো! পাঁচ বছর কোন খবর পাইনি, কে জানে সে কেমন আছে—। ওই যেন কার পায়ের শব্দ হচ্ছে, না রে সর্বাণী? [উৎকর্ণ হলেন]।

[সর্ব্বাণী বাইরে কান পেতে শুনলো, ওঠে সামনের দরজায় গেল। তার পর ফিরে এসে মার শিয়র বসলো।]

সর্বাণী—না মা, ওটা বাতাসের শব্দ, কাউকে তো দেখতে পেলুম না মা?

মা—আমার যে আর সময় নেই সর্বাণী, তাকে যে আমার অনেক বলে যাবার ছিল,—দিয়ে যাবার ছিল অনেককিছু। [দীর্ঘশ্বাস, একটু পরে] ও দেবতা, মানুষ নয়! অতো বড়, অতো উদার মানুষ হ'তে পারে না। তোর তাকে মনে পড়ে সর্বাণী?

সর্বাণী—হ্যাঁ মা! বছর পাঁচেক আগে তা'কে তিন চার দিন দেখেছি, তারপর বিদেশ বেড়াতে গেলেন। এ তো তারি বাড়ী, না মা?

মা—[আপন মনে বলে যেতে লাগলেন] সে, আসবে,—আসবে বই কি! সে যে মিথ্যা জানে না। মনে রাখিস সর্বাণী, সে ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। যেদিন আমাদের আর কেউ ছিল না সে দুঃখের দিনে তাকে পেয়েছিলুম।

সর্বাণী—সে আমি জানি মা!

মা—জানিস্, তা' জানবি ই তো! বিজয়ের মামাতো ভাই, যবার সময় বিজয়কে রেখে গেল,—বড় ভাল ছেলে ওই বিজয়! বিজয় কোথায় রে!—

সর্বাণী—বাড়ী গেছেন,—ডাকবো?

মা—কেন, ভয় পেয়েছিস? অই তো আমি ভালই আছি—

সর্বাণী—অতো বেশি কথা কয়ো না মা?

মা—[ম্লান হেসে] আর যে বলাই হবে না রে, বলতে দে আমাকে—বলতে দে সর্বাণী! ভয় পেয়েছিস্? ভয় কিসের মা,— এই তো জীবন—সারা জীবন দুঃখ—এই তো সুরু—তারপর—[একটু থেমে] কই অনন্ত? এলো না সে আজো? ঠিক সময়ে আসবে! বড্ড দেরি হয়ে গেল!—সর্বাণী?

সর্বাণী—কেন মা?

মা—তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, এবার তুই চলতে পারবি এটুকু ভরসা নিয়ে মরছি—আর কিছুই তোকে

দিয়ে যেতে পালুম না। পৃথিবীতে অপরিচিতা একা তোকে রেখে গেলেম মা, মাকে তোর ক্ষমা করিস।

[সর্বাণী মায়ের চোখের জল আঁচলে মুছে দিল]।

সর্বাণী—মা—মা—

মা—সবি বুঝিরে—সব বুঝি! শুধু ওই কথাটে জিজ্ঞাসা করিস্ নে মা জেনে রাখ তিনি আছেন,—বড়লোক—না - না, ক্ষমা করতে পার্লেম না—পার্লেম না সর্বাণী! ও নাম আমি করতে পারবো না—পারবো না অন্যায়কে মেনে নিতে! আমার অহংকার—সেটুকু নিয়ে মরতে দে মা -

[সর্বাণী তার মুখে করুণ চোখে চেয়ে রইল]।

মা—[কি যেন ভাবতে লাগলেন, তারপর একটু থেমে সর্বাণীকে বলতে লাগলেন] সে এলো না সর্বাণী, ঠিক সময়ে আসবে! সে এলে ওই খামখানা তাকে দিস মা, আর কাউকে দেখাস নে যেন! [কাপড়ের ভাঁজ হতে খুলে সর্বাণীর হাতে একখানা বন্ধ খাম দিলেন] অনন্ত রইলো, তোর পরিচয় রইল তারি হাতে, তারি হাতে তোকে রেখে গেলেম। আমার একটি অনুরোধ রাখিস সর্বাণী, তার অবাধ্য

কোনদিন হোস নে মা—তোকে আমার ওইটেই ভয় ! বল্ রাখবি সর্বাণী -নিশ্চিন্তে আমাকে যেতে দে মা -

[ধীরে ধীরে মৃত্যু তাকে আচ্ছন্ন করতে লাগলো]।

সর্বাণী—[খামখানা উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখে কাপড়ের ভাঁজে রাখতে রাখতে বললো] তাই হবে মা—তাই হবে—

মা—[মাথায় হাত ঠেকিয়ে অনিদেশের উদ্দেশে প্রণাম করলেন, ধীরে ধীরে বললেন] সে আসবে ঠিক সময়ে আসবে -

[প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল]।

সর্বাণী—মা—মা

[দ্রুত এসে বিজয় ঢুকলো]

বিজয়দা—

বিজয়—[ভাল করে দেখে] নেই—সবশেষ—। তোকে কিছু বলে গেছেন সর্বাণী ?

সর্বাণী—[খাম দেখিয়ে] ওখানা অনন্তবাবুকে দিতে বলে গেলেন। [সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে]

[বিজয় খামখানা উল্‌টিয়ে দেখে সর্বাণীর হাতে ফিরিয়ে দিল]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সর্বাণীর ঘর

সকাল ৮টা।

[বিজয় ও সর্বাণী বসে চা খাচ্ছে, সামনে টেবিলের উপর অসংখ্য বই ছড়ানো—।]

বিজয়—তারপর সর্বাণী, কি করবি ঠিক করেছিস্ ?

[বিজয় চায়ে চুমুক দিল ।]

সর্বাণী—কিছু না —

বিজয়—তা কি হয় রে !

সর্বাণী—আচ্ছা সবি করবো,—লিখবো, পড়বো, খাবো, ঘুমুবো, কাজ করবো—

[দু'জন হেসে উঠলো]

বিজয়—[কৃত্রিম গম্ভীরতায়] থাম তো সর্বাণী, তুই একেবারে বাজে হয়ে যাচ্ছিস, আমাকে একেবারে কেয়ার করিসনে। জানিস্—আমি তোর বড় —

[চায়ে চুমুক]

সর্বাণী—[মুখ ভার করে] বকলে বিজয়দা—

[চায়ের পেয়ালায় চাইলে, চোখে হাসি ।]

বিজয়—বকবোনা ! [সর্বাণীর মুখে চেয়ে দেখল, কিছু বুঝতে না পেরে] এটুকুতে রাগ করলি সর্বাণী, তুই ছাড়া আর

যে কাউকে বকতেও পারিনে রে, আমার যে ছোট বোন বলতে তুইই আছিস, আমি যে আর সবারই ছোট। বাড়ীতে সবাই ভাবে পাগল—রাগে কথাই কই না ; বাইরে সবাই করে তুচ্ছ। জয়ন্তীদি তো আমাকে মানুষই মনে করে না—

সর্বাণী—[গম্ভীর] তোমার ওই জয়ন্তীদির ঠিকানাটা দাওতো, জানিয়ে দি একটা চিঠি লিখে তোমার এ দুঃখটা—

বিজয়—[ব্যস্ত হয়ে] দেখিস্, ওসব পাগলামী করিসনে যেন, ওই জয়ন্তীদিটি বড্ড ভাল, আর যা গাইতে পারে—

[বিজয় খুশি হয়ে উঠলো।]

সর্বাণী—আর তোমার কবিতার বুঝি খুব প্রশংসা করেন!

বিজয়—তাতো করবেই, তোদের মত বোকা তো নয়।

সর্বাণী—[মৃদুহাস্য] তুমি প্রশংসা খুব ভাল পাও—না বিজয় দা ?

বিজয়—[সরোষে] আর তুই ভাল পাস নে বুঝি! তোকে যদি বলি কালো, কুৎসিত, খাঁদা, গাধা—কেমন লাগে বল তো! [একটু থেমে] প্রশংসা সবাই ভাল পায় রে! কবিদের যে ওটাই পাওনা, এ ছাড়া যে আর কিছুই নেই। ওরা দিয়েই যায়—পাওনা যে ওদের থাকতে নেই বোন! ওদের হাড়ির খবর কেউ তো কোন দিন নেয়নি সর্বাণী,—ওরাও না—মানুষও না। কবিরা প্রশংসা কুড়িয়েছে আর মানুষ ভেবেছে ওটাই ওদের উপরি পাওনা—

সর্বাণী—তোমার লেকচার থামাও বিজয় দা, আমি যে হাঁফিয়ে উঠছি। চাটা জুড়িয়ে একেবারে জল হয়ে গেল যে—

বিজয়—[চায়ে চুমুক দিয়ে, ম্লান হেসে] ওই তোদের দোষ, কোন কিছু তোরা একবারে ভাবতে পারিস্ নে। বড় দুঃখেই এসব বলতে হয়রে। নে, থামালুম, এবার কি বলবি বল।

সর্বাণী—আর কিছু একটা বল না, নইলে গানই ধরো—

বিজয়—[কৌতুকে] এবার তোর জন্য বরং একটি ভাল বর দেখি, কি বলিস্! বিয়ে করবি সর্বাণী?

সর্বাণী—শুধু ওইটে হয় না বিজয় দা—

[সর্বাণীর মুখ ম্লান হয়ে এলো, বিজয় মুহূর্তে অন্যদিকে তাকালো যেন একটা মারাত্মক ভুল তার হ'য়ে গেছে।]

[বাইরে রঞ্জন ডাকলো—বিজয়—আছো—]

বিজয়—[সর্বাণীর দিকে চেয়ে] ওই যা, তোকে বলতেই ভুলে গেছি। রঞ্জনদা, তোর সঙ্গে দেখা করতে চান, তাকে আসতে বলেছিলাম আটটায়—ওই যাদের কথা তোকে বলি—জয়ন্তীদি আর রঞ্জনদা—। রঞ্জনদা খুব ভাল রে।

সর্বাণী—ওই কিশোর বাবুটির মতো তো--

বিজয়—[তিরস্কারের সুরে] কি বলতে কি ভুলে বলে ফেলেছিল, কতো মাপ চাইলো আর তুই তা' মনে করে রেখেছিস বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছিস সর্বাণী—

রঞ্জন—[ঘরে ঢুকে] না সর্বাণী, এ কিশোর বাবুটির মতো নয় - চেয়ে দেখোনা একেবারে আলাদা—

[সর্বাণী মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার করলো।]

রঞ্জন—[চেয়ারে বসে] তোমার কথা অনেক শুনেছি সর্বাণী, তাইতো কৌতূহল সামলাতে পারলাম না—

[সর্বাণীকে চেয়ে দেখতে লাগলো।]

সর্বাণী—[একটু সঙ্কুচিত] কে বলেছে—বিজয় দা ?

রঞ্জন—হ্যাঁ—

সর্বাণী—[সপ্রতিভ] বিজয়দা তাহলে আমার প্রশংসাও করে—

[তিনজন একসঙ্গে হেসে উঠলো।]

রঞ্জন—সত্যি সর্বাণী আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এতোদিন তোমাকে তো কোথাও দেখিনি ?—

সর্বাণী—সেটা আপনার কৌতূহল হয়নি বলেই। সত্যিই তো কৌতূহল হবার কি ই বা আছে ? [একটু ভেবে] আর সেটা বিজয়দারও দয়া, সে নিশ্চয় আমার বিষয় চুপ করে ছিল—

[বিজয়ের দিকে উজ্জল দৃষ্টি।]

বিজয়—আমিই যেন সবাইকে ডেকে আনি! এ বড় বেশি গর্ব সর্বাণী,—তোর বিষয় ছাড়া যেন আমার আর কিছু বলবার নেই—এই যে রঞ্জনদা এলেন একি আমিই নিয়ে এসেছি বলতে চাস—বলতে চাস আমার আর কোন কাজ নেই ওই ডেকে আনা ছাড়া—

সর্বাণী—[অর্থপূর্ণ হাসি]—আনো না ?—

[রঞ্জন গম্ভীর ভাবে চেয়ে যেন কি ভাবলো, বুঝতে চেষ্টা করলো।]

রঞ্জন—[গম্ভীর ভাবে] আমি কিশোরের মত নই সে কথা বিশ্বাস করো সর্বাণী! বল বিশ্বাস কর—

সর্বাণী—[একটু চেয়ে মাথা নেড়ে] হ্যাঁ, করি।

রঞ্জন—আমার এ আসায় কিছু মনে করো নি ?

সর্বাণী—না বরং খুশিই তো হয়েছি। আপনি যে আসতে পারেন তা তো কোনদিন ভাবতে পারিনি, এ যে আমার সৌভাগ্য—

রঞ্জন—যদি আসি কিছু মনে করবে না ?

[সর্বাণী মাথা নাড়লো। বিজয় চিন্তা করছে।]

বিজয়—[হঠাৎ রঞ্জনের দিকে চেয়ে] আচ্ছা রঞ্জনদা, অংশু বাবুকে তুমি চেনো ?

রঞ্জন—কেন বল তো।

বিজয়—আমি ভাবতাম আর কেউ তাকে চিনে না!

রঞ্জন—তাঁকে চিনি কিন্তু জানিনে। জিজ্ঞাসা করলে দেখবে অনেকেই তাকে চিনে কিন্তু কেউ তিনি যে কি সে পরিচয় বলতে পারবে না, আমিও তা পারবো না ভাই।

সর্বাণী—[চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কণ্ঠে ব্যঙ্গ] আশ্চর্য—!

রঞ্জন—[সর্বাণীর দিকে চেয়ে দেখলো] সত্যিই তাই!

[মুখে হাসি।]

সর্বাণী—[কণ্ঠে ব্যঙ্গ] আপনারা না তিনি! চিনেন অথচ জানেন না, আপাততঃ আপনারাই আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকছেন। [চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মুখে ব্যঙ্গ-মাখা হাসি, মাথা নেড়ে] তখন আপনি খুব ছোট ছিলেন —না? আচ্ছা—আপনার মনে পড়ে তিনি দেখতে কেমন ছিলেন?

রঞ্জন—[মনে মনে চটলো, মুখে তারি ছাপ পড়লো] এ তোমার মিছে ব্যঙ্গ সর্বাণী, কি বলছো জানো না তাই বলতে পারছো। মানুষকে আজো তুমি মোটে চিনতে পারোনি। কলেজের বই পড়ে পরীক্ষা পাশ চলে— মানুষ চিনা চলে না।

সর্বাণী—[চোখে মুখে ব্যঙ্গের অভিব্যক্তি] কিন্তু যতোটুকু চিনেছি তাতেই মোহটা কেটে গেছে। অভিজ্ঞতাটা আর যত কম হয় ততই ভাল।

[বিজয় বসে বসে ভাবছে]

রঞ্জন—[চটে] যা'দেরে তুমি দেখেছো তা'দের বাইরেও মানুষ আছে, আর মানুষকে চেনাটা ছেলে খেলা নয়। এক এক জন লোক আছে যাদের কাছে সবাই ছেলে মানুষ,—আর অনন্তদা সেই জাতের মানুষ! আসলে তোমার মানুষের অভিজ্ঞতার মূলে রয়েছে ভুল।

সর্বাণী—আমি মানুষকে মানুষ রেখেই ভুল করি আর আপনারা ভুল করেন অতি মানুষ করে এই যা তফাৎ!—অবশ্য যে ভুলের উপর আপনারা এ সমাজের গোড়া পত্তন করেছেন—[একটু ভাবলো] তা থাক্, আপনার কথাই বলুন—

রঞ্জন—এসব তোমার কথা নয় সর্বাণী, আমি জানি মূলে আরো কিছু আছে! আমার কথাই বলি। অনন্তদার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সব চেয়ে আশ্চর্য জিনিষ হল—তিনিই যেচে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করেন। আমার তখন বুদ্ধিমান আর ভাল ছেলে বলে নাম আছে, ভাবলাম তাই। সেদিন কিন্তু প্রমাণ হয়ে

গেল আমি একেবারে ছেলে মানুষ। [সর্বাণীর মুখ হতে চোখ বিজয়ের মুখে নিয়ে] জানিস্ বিজয় সেদিন আমাকে তিনি কি বলেছিলেন ?

বিজয়—কি রঞ্জন দা ?

রঞ্জন—বলেছিলেন মানুষের কথা—সমাজের কথা। বলেছিলেন জগৎটাকে নূতন করে গড়তে হবে, একটা মিথ্যা যুগের প্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি যা' মানুষকে মানুষ হতে দিচ্ছে না, মিথ্যা সংস্কারে পঙ্গু করে রেখেছে। মানুষকে নূতন করে মানুষ করতে হবে, নিয়ে আসতে হবে নূতন যুগ, আর সে দায়িত্ব তিনি ঘাড়ে নিয়েছেন। তার সে নূতন জগতে মানুষ হবে মানুষ—অবিচার থাকবে না, মুক্ত মানুষের সমাজ ছাড়া সমাজ থাকবে না! আমার চোখে জল্ জল্ চোখ দু'টি মেলে বলেছিলেন,—উঃ কি জ্বালাভরা চোখ দুটি, আজো আমি তা ভুলতে পারিনি, ভেবে পাইনি কেন তা বলেছিলেন! বলেছিলেন,—জানো রঞ্জন, এ সমাজে মানুষ অন্যায় করে, সমাজ তা' মেনে নেয়। আমরা ভুলে যাই মেয়েরাও মানুষ,—সংস্কার মানুষের ধর্ম নয়। বাইরে পা বাড়ালে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করায় সমাজের জোর প্রমাণ হয় কিন্তু সত্য প্রমাণ হয় না। অন্যায়টাকে চালানো চলে,—

সেটা জোর, সত্য নয়! আমি মানুষকে মানুষ হিসাবে পরিচিত করবো, দাঁড় করাবো একা, মানুষকে বাঁচাবো! বলেছিলেন,—রঞ্জন, জগতে দুঃখটাই সত্যি আর আমি করবো এ সত্যের প্রতিষ্ঠা!—আজো আমি অবাক হয়ে তাই ভাবি! কি এমন ঘটনা ছিল তার পেছনে জানিনা, জানি শুধু একটা কিছু ছিল আর তিনি আশা করেছিলেন আমি বুঝবো! [একটু থেমে, সর্বাণীর দিকে চেয়ে] জানো সর্বাণী, এ মানুষ তোমার হিসাবের বাইরে পড়ে। সঙ্ঘদত্তের নাম শুনেছো?

সর্বাণী—শুনবো না কেন, জগৎ জোড়া ভাবধারায় বিপ্লব এনেছে। 'সেবক সঙ্ঘের' ভিতর দিয়ে সারা জগতে এনেছে মানুষের জন্য স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন। সবাই তো এ নাম জানে! বিপ্লবী সঙ্ঘদত্তকে কে আজ না জানে বলুন!

রঞ্জন—এ 'সেবক সঙ্ঘ' নিয়েই জয়ন্তী আজ মেতে আছে। জানো সর্বাণী অনন্তদার সঙ্গে আমি মিশবার সুযোগ পেয়েছি, তার মতগুলো না বুঝলেও তা' আমার জানা, আর সেগুলো হুবহু ওই সঙ্ঘদত্তের 'সেবক সঙ্ঘের' মতের সঙ্গে মিলে যায়। অনন্তদার কোন খবর পাইনি আজ পাঁচ বছর,—তাকে যারা জানতো

আমার বিশ্বাস আজ সবাই তার কথা ভাবে। [মাথা নেড়ে] কিন্তু এবার হাসলে না তো!

সর্বাণী—তিনি পাঁচ বছর আগে এ সব বলেছেন আর 'সেবক সঙ্ঘ' আজ দশ বছরেরও উপর চলছে—প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে—এতো মিথ্যা নয়?

রঞ্জন—এ দিয়ে অনন্তদাকে বিচার করো না সর্বাণী! যারা তাকে দেখেনি তারা এ ভুল করবে সত্যি, [একটু ভেবে] কিন্তু তারা তো তার কথা জানবে না! [বিজয়কে] বিজয়, তুই তো একদিনও তার কথা বলিস নি!

বিজয়—তিনি আমার মামাতো ভাই, তুমিও তো তার কথা কোন দিন বলনি রঞ্জন দা!

রঞ্জন—বলিনি সত্য,—ভেবেছি।—তার কথা, জয়ন্তীর কথা, সেবক সঙ্ঘের কথা! তার কথা যে বলবার নয়,—তাকে যে আমি চিনি! তার পরিচয় জানিনে, অবাক হয়ে ভাবি তিনি কি?—

[সর্বাণী উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো, ঘরের আবহাওয়ায় লাগলো গম্ভীর স্পর্শ।]

বিজয়—সত্যি!—

রঞ্জন—[আগের কথার রেশ টেনে বলে যেতে লাগলো, যেন আপন মনে বলছে] অদ্ভুত ওই লোকটি, জগতের

সর্বত্র তাঁর কাজ। গায়ে অসীম শক্তি, অদম্য সাহস—বিরাট প্রতিভা। অসাধারণ বিরাট একটা কিছু, তার বিষয় কেবল কল্পনাই করা চলে,—অবাক হয়ে দেখা চলে,— মোটে জানা যায় না। তাঁর সঙ্গে মিশবার সুযোগ খুব কম লোকই পেয়েছে, আমি পেয়েছি কিন্তু জানতে পারিনি। 'সঙ্ঘদত্ত' যাকে নিয়ে এতো আলাপ আলোচনা চলছে আজ, যাকে নিয়ে আজ হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে,—জয়ন্তী তারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কি না আর তার মুখে তো সে আদর্শের বাণী শুনি! অবাক হয়ে ভাবি কেমন করে অনন্তদার সঙ্গে তার এ মিল সম্ভব হলো! অবশ্য জয়ন্তীকে কোনদিন এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিনি --তবু ভাবি—

[রঞ্জন কি যেন ভাবতে লাগলো।]

সর্বাণী—কে ওই সঙ্ঘদত্ত বিজয়দা? অতো নাম—সবারই মুখে—সব কিছুতে—

বিজয়—তাই তো বোন, কেমন করে বলবো? কেউ যে তাকে দেখেনি সর্বাণী! এ যেন এক রহস্য—এক আভাস! বিপ্লবী সে, এইতো জানি—সারা জগতে বিপ্লব এনেছে তার মহা মানবের স্বপ্ন—'সেবক সঙ্ঘ',—সারা জগৎ দেখতে দেখতে ছেয়ে ফেললো—

সর্বাণী—[আশ্চর্য] কেউ তাকে দেখেনি বিজয়দা?

বিজয়—না, ও যেন শুধু একখানা আইডিয়া, মানুষকে মানুষ হবার আদেশ! তাঁর কাছে সব কিছু ফেলে রেখে একা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে, টাকা পয়সা কিছু নেই, সব ছেড়ে দিয়ে জগৎ জুড়ে এক বিরাট মানব পরিবারের স্বপ্ন, শুধু কাজ! সেখানে সবই আছে কিন্তু কিছুই মানুষের নিজের জন্য যেন নয় বোন, মানুষ একা মানুষই শুধু। মানুষ মানুষ হতে চলেছে আর তার জন্য রয়েছে অনন্ত দুঃখ—বুকজুড়া হাহা-কার,—কিছু বুঝলি সর্বাণী? [মৃদু হাসি] আমিই কি কিছু বুঝি রে—'সজ্যদত্ত'—এটুকু মাত্র—এর বেশি নয়।

সর্বাণী—কিন্তু যেখানে সুখ নেই তেমন জগৎ দিয়ে আমাদের কি হবে বিজয় দা?

বিজয়—কোন তফাৎ নেইরে, এ যে মানুষের পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাওয়া। মানুষ থাকবে মানে সবই ঠিক থাকবে।

সর্বাণী—[ভাবলো] ঠিক বুঝি না বিজয় দা…

বিজয়—জানো রঞ্জন দা, তিনি আসছেন—ওই সজ্যদত্ত!

সর্বাণী, রঞ্জন—[এক সঙ্গে] সত্যি!

বিজয়—সে তোমরা বিশ্বাস করবে না রঞ্জন দা, সে কি দৃশ্য! হাটে, মাঠে, পথে সবার মুখে শুধু এক কথা—সে আসছে! কে? কবে? কেমন করে জানলে?

প্রশ্ন—কানাকানি ! বাতাস বলে গেছে ! আজ থেকে অষ্টম দিনে সোমবার চারটায় আসবে সঙ্ঘদত্ত। কতো গুজব, কতো বর্ণনা ! মানুষের সে দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না—এ যেন এক বিরাট ঢেউ, বিপুল আবেগ !

রঞ্জন—সোমবার চারটে ; এ গুজব তো মিথ্যা হবার নয়,—বাতাসে ভেসে আসে তার আগমনী, সবাই থাকে প্রত্যাশায়—হঠাৎ চেয়ে দেখে তিনি কখন এসে চলে গেছেন, এই যে তাঁর আসার নিয়ম বিজয় ! এবার তা' হলে দেখা যাবে—দেখতে পাবো আমরা ?

বিজয়—মোটে না। তার খবর যেমন হাওয়ায় ভেসে আসে তেমনি তিনি অলক্ষ্যে এসে চলে যান। কতো আয়োজন পড়ে থাকে রঞ্জন দা, কতো প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইতো নিয়ম—বিরাটকে কি আবার দেখা যায় ? বিরাট বলেই যে তা' আমাদের চোখকে ঢেকে রাখে, দৃষ্টিকে দেয় ফাঁকি !

সর্বাণী—[রঞ্জনকে] দেখুন, বিজয়দার কথা মোটে বিশ্বাস করবেন না। কবি কি না, তাই যা' বলে সবই মনে হয় সত্য।

রঞ্জন—ভেবো না সর্বাণী, বিজয়কে অমি ঠিকই চিনি, তাকে আমার ভুল হবে না।

বিজয়—কি বললি, কবিরা মিথ্যা বলে? দেখ সর্বাণী, কবিরা যা' দেয় সেটা গুপ্তধন—উপলব্ধিতে পাওয়া—তাতে অসত্য নেই। তোরা বুঝতে পারিসনে তাই যা' তা' বলিস।

সর্বাণী—কবি বলে তোমার খুব গর্ব—না বিজয় দা?

বিজয়—গর্ব করবো না? কবি কি আর সাধারণ, ইচ্ছা করলেই হওয়া চলে? এ যে হওয়া জিনিষ—না. তোরা আমাকে বুঝতে পারলি নে [মাথা নাড়লো] কাছে থাকলে অসাধারণটা ওরকমেই তুচ্ছ হয়ে পড়ে—

[কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ]

সর্বাণী—[হাসি মুখে] এই ঠিক হল বিজয়দা, গম্ভীর হওয়া তোমাকে মোটে মানায় না—

[সকলের মুখে হাসি. ঘরের বাতাসটা সহজ হয়ে এলো।]

রঞ্জন--অনন্তদার কথাটা কেন পাড়লে বিজয়? পাঁচ বছর আগে তাকে দেখেছি, আর তো তার বিষয় কিছুই জানিনে!

বিজয়—আমি ভাবতাম আর কেউ তাকে জানে না, হঠাৎ দেখলাম তুমি তাকে জানো—তাই।

রঞ্জন—কেমন করে জানলে?

বিজয়—তাঁর চিঠি পেয়েছি, তাতে তোমার কথা লেখা আছে। তিনি আসছেন—আজ সোমবার-না?—সামনের

রোববার সকালবেলা—তোমার ওখানে। তোমাকে জানাতে লিখেছেন—আর কেউ যেন না জানতে পারে—

রঞ্জন—তাই ভাল, জয়ন্তীকে একেবারে চমকিয়ে দেবো।

সর্বাণী—[সুরে অভিমান] আমাকে তিনি চিনেন না—না বিজয় দা ?

বিজয়—সে কি রে! তোর কথাতেই তো চিঠি ভর্তি। তিনি সব জানেন সর্বাণী, জগতে তার অজানা কিছু নেই—

সর্বাণী—[ক্ষুব্ধ] তা' হলে আমাকে লিখলেন না কেন ? আমার কথা তোমার চিঠিতে না লিখলেও তো চলতো। চিঠি দেখাবে বিজয় দা ?

বিজয়—ওইটে পারবোনা সর্বাণী, রাগ করিসনে বোন! জগতে সবকিছু সবার জন্য নয় রে, চিঠিটা শুধু আমারই পোষায়—

সর্বাণী—[অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে] তা' হ'লে দেখাবে না ?

বিজয়—[সস্নেহ রোষে] দেখ সর্বাণী, তোদের মাথায় একেবারে কিছু নেই,—গোবর ভর্তি। মেয়েরা একেবারে বোকা—

সর্বাণী—[কৌতুকে] কিন্তু গোবরের সারটার কথা ভুলে যাচ্ছ বিজয়দা, রাগলে ছেলেদের জ্ঞানই থাকে না—

[রঞ্জন উপভোগ করতে লাগলো, সর্বাণী তার দিকে হাসিভরা উজ্জ্বল চোখে চেয়ে দেখলো।]

বিজয়—সার না হাতী, মেয়েদের মাথায় কিছুই নেই—

সর্বাণী—[অভিমানে] ওই আবার বকছো—তোমার জয়ন্তীদিও বাদ পড়েন না—

বিজয়—[সস্নেহে] তোর প্রশংসাও তো করি, রঞ্জনদাকে জিজ্ঞাসা কর না। আর জয়ন্তীদিটি এক্‌সেপ্‌সন—

[তিনজন হেসে উঠলো।]

[একটু পরে]

রঞ্জন—অনন্তদা সর্বাণীকে চিনেন ?

বিজয়—বারে, তিনিই তো ওদেরে ওখানে রেখে গেলেন,—ওরা তো তারই সঙ্গে ছিল !

[রঞ্জন অবাক হয়ে সর্বাণীর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।]

রঞ্জন—সর্বাণী, তুমি কোথাও যাও না—না ?

বিজয়—কতো বলেছি রঞ্জনদা, তোমাদের ওখানে নিয়ে যেতে চেয়েছি, ও কোনমতে যাবে না—একেবারে কুনো—বেরোতেই চায় না—

সর্বাণী—জীবনটা তো আর কবিতা নয় বিজয়দা—

বিজয়—ওই যা, আবার ভুল করলে ! কবিতা যে বড়, জীবনটাতে যে সুর ধরা পড়ে না তাই তো কবিতায় ধরে তোদের হাতে তুলে দিই—না—একেবারে বোকা কিছু বুঝলে না—

রঞ্জন—আমি বিকালে আসবো সর্বাণী, তোমাকে বেড়াতে যেতেই

হবে। এখন আসি [বিজয়ের দিকে চেয়ে] রবিবার সকাল—না?

[বিজয় মাথা নাড়লো, রঞ্জন বেরিয়ে গেল]

সর্বাণী—অদ্ভুত এ জোর রঞ্জনবাবুর। রঞ্জন বাবু খুব ভাল লোক, না বিজয় দা?

বিজয়—কি জানি বোন, সবি কি আর বুঝি রে! কিন্তু তোকে তো চিনি সর্বাণী, আর আমিও তো আছি,—ওসব থাক—

সর্বাণী--তিনি আসছেন, সত্যি চিঠি পেয়েছো?

বিজয়—আমাকে কি মিথ্যা বলতে শুনেছিস কোন দিন? ওই দিন তিনটায় তোকে যেতে বলেছেন। মনে রাখিস, খামখানা নিতে ভুলিস নে যেন—তিনটায়—

সর্বাণী [মাথা নেড়ে] তোমার কথা মোটে বিশ্বাস হয় না!

বিজয়—[কপাল দেখিয়ে] মানুষ ওইখানেই তো ভুল করে, আমাকে মোটে বুঝতেই পারে না—বলে পাগল।

সর্বাণী—চিঠি দেখাবে?

বিজয় [কৃত্রিম গম্ভীরতায়] দেখ সর্বাণী, এবার আমি সত্যি চটে যাচ্ছি। জানিস্, চটলে আমি অসাধারণ হয়ে পড়ি—তাইতো চটতে চাইনে। কিন্তু তোদের জ্বালায়—

যবনিকা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রবিবার

স্থান—রঞ্জনের বাড়ী।

সময়—প্রভাত, পূবে রঙ ধরছে।

(বাহির হইতে বিজয়ের আহ্বান)

বিজয়—জয়ন্তীদি—রঞ্জনদা—এখনো ঘুমুচ্ছো?

[বিজয় ঘরে ঢুকলো।]

পূবে যে রঙ ধরছে, সময় যে বয়ে যায়—কোথায় তোমরা—কোথায়?

[অন্য দিক দিয়ে জয়ন্তী এসে ঘরে ঢুকলো, চোখে ঘুম জড়ানো।]

জয়ন্তী—[যেন স্বপ্নে] কি ভাই—

বিজয়—আলোক যে এলো বলে—এ যে আজ অভ্যুদয়—কোথায় আয়োজন—কোথায় উপচার—উৎসব কর ভাই—উৎসব কর—

জয়ন্তী—সত্যি ভাই, আমারও মনে হচ্ছে—কিসের যেন আজ আবির্ভাব হবে—আলোকই আসছে যেন, আজ যেন শুধু উৎসব—শুধু আনন্দ—

বিজয়—[উৎকর্ণ হয়ে] ওইযে শুনছো না, চারিদিকে আগমনীর শঙ্খ, সময় হয়ে এসেছে—এলো বলে—কি যেন শুনতে লাগলো]।

জয়ন্তী—এ যে চমক হানছে, এ যে চমকিয়ে দিলে গো! এ কে ভাই—কে এ? বিশ্ব রাঙিয়ে এ কার আবির্ভাব?—একি স্বপ্ন—

বিজয়—[গান]

অভ্যুদয়ের বাঁশী শোন বাজে,
আলোকের গান খানি ওই আকাশে বিরাজে।
প্রভাতের আলোয় যে আজ রঙ ধরালো মেঘের সারে,
উতলা পবন এসে বললো কাণে বারে বারে—
বাজারে তোর শঙ্খ বাজা
হয়নি কি তাঁর আসন সাজা,
আনন্দ তার আলোয় ঝরে আকাশ ভুবন মাঝে!

—আনন্দ আজ—আনন্দ ভাই! পূবের আলোয় আনন্দ—রঙধরা মেঘে আনন্দ—উপছে পড়া মনে আনন্দ—

জয়ন্তী—তাইতো, মনে যে আজ আনন্দেরি গান শুনছি—ওই প্রভাতের আলোয় তা' ভরে উঠছে যেন,—ছড়িয়ে পড়ছে—চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—

[রঞ্জন এসে ঘরে ঢুকলো।]

রঞ্জন—আজ এ সকাল বেলা তোমরা এ কী সুরু করলে—এ কী সুরু করলে জয়ন্তী!

জয়ন্তী—[রঞ্জনের মুখে চেয়ে] আনন্দ—আনন্দ কর—! শোনছো না—বাইরে কিসের গুণগুণানি—কিসের উৎসব? চারদিকে যে আজ অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছি—তার স্পর্শ যে চেতনাকে ভরিয়ে দিলে গো, পাগল করা এ—এযে উৎসব।

রঞ্জন—তাইতো, আমিও পাগল হয়ে উঠবো দেখছি। তুমি আজ একেবারে বদলে গেছ জয়ন্তী,—কতো সুন্দর—কতো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তোমাকে—

বিজয়—এ যে সুন্দরের স্পর্শ রঞ্জন দা, এ যে অভ্যুদয়—

অভ্যুদয়ের বাশী শোন বাজে,
আলোকের গান খানি ওই আকাশে বিরাজে।

[বিজয় আপন খেয়ালে বেরিয়ে গেল। দূর হতে ভেসে আসতে লাগলো তার গানের সুর, জয়ন্তী আর রঞ্জন নীরবে বসে শুনতে লাগলো। নীরবতা ভঙ্গ করলো রঞ্জন।]

রঞ্জন—জানো জয়ন্তী, সঙ্ঘদত্ত আসছেন—কাল সোমবার না—কাল বিকেল চারটায়—

জয়ন্তী—সবাই তা' বলছে, বাতাসে রটেছে তাঁর আসবার খবর—তাকে তো কেউ দেখেনি! চুপি চুপি তাঁর আসা যাওয়া চলছে চিরদিন, বাতাসে তিনি ভেসে বেড়ান।

তিনি যে কারো নন—তিনি যে প্রত্যেকের—জগতের সব মানুষের—

রঞ্জন—সারাজগতে তার আহ্বান, তার গতিবিধি—অথচ কেউ তাকে দেখেনি। মানুষের ভবিষ্যতে মহা-বিপ্লবের যে করলো সূচনা তাকে কেউই চিনে না। কোথা হ'তে তার বাণী আসে, ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মনে—কেউই বলতে পারবে না তা,—এ কী আশ্চর্য নয় জয়ন্তী? সঙ্ঘদত্ত আসছেন কাল চারটায়!—

জয়ন্তী [যেন শুনতে পায়নি রঞ্জনের কথা, আপন মনে বলে যেতে লাগলো] সত্যি আজ অদ্ভুত ঠেকছে, অবাক হয়ে ভাবছি এ কী।

রঞ্জন—আমারও এ অদ্ভুত লাগছে জয়ন্তী—তোমাকে আজ অদ্ভুত লাগছে। কতো বদলে গেছ—কতো স্বাভাবিক—বুঝতে মোটে কষ্ট হয় না। তোমার এ রূপ কেন তুমি ঢেকে রাখো?—তুমি এতো সহজ আজ তোমাকে না দেখলে মোটে তা জানতাম না জয়ন্তী! কোথা হ'তে তোমার উপর এ আবরণ আসে, আগাগোড়া তোমাকে ঢেকে দেয়—

জয়ন্তী—[রঞ্জনের কথায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলো] স্বপ্ন দেখছিলাম, ভারি সুন্দর স্বপ্ন—তারি রেশ যেন এখনো চলছে! [রঞ্জনের দিকে চেয়ে]

শুনবে,—শুনবে সে স্বপ্ন ! দেখছিলাম আমি আঁধারে দাঁড়িয়ে আছি--কে যেন আসবে তাই ! আঁধারে দাঁড়িয়ে আছি, সে কী আঁধার—ভয় হয়—আঁৎকে উঠতে হয় ! এমন আঁধার কোনদিন দেখিনি, হাত মেলে ধরলে তা' দেখা যায় না [জয়ন্তী হাত মেলে দেখতে লাগলো, যেন আঁধারে দাঁড়িয়ে হাত মেলে দেখছে] । ভয় করতে লাগলো। তারপর··· [জয়ন্তীর চোখমুখ দীপ্ত হয়ে উঠলো] তারপর ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হতে লাগলো,—আঁধার গলে আলো আসছে,—সব কিছুতে রঙ-ধরলো,—হল আবির্ভাব—বিরাট বিস্ময়—

[জয়ন্তী বাইরে তাকিয়ে রইল, যেন চোখের সামনে সে দেখছে— ।]

[এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো অনন্ত]

রঞ্জন, জয়ন্তী—[একসঙ্গে] অনন্ত দা !

[দু'জন তা'কে পায়ে ধরে প্রণাম করলো। অনন্ত তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো !]

রঞ্জন—বসো অনন্তদা, পাঁচ বছর পরে এলে ! [আশ্চর্য]

অনন্ত—আমার তো ছুটি নেই রঞ্জন !

জয়ন্তী—পাঁচবছর—এতোদিন পরে এলে ! [ক্ষুব্ধ অভিমান]

অনন্ত—[জয়ন্তীর দিকে চেয়ে] হ্যাঁ, তাইতো এলুম—না এলে যে চলে না। প্রয়োজনেই যে আমি আসি জয়ন্তী ! আমি যখন আসি তখন আসে প্রয়োজনের প্রচণ্ড তাগিদ, তুচ্ছ বড় হয়ে দেয় দেখা !—পথের বাধা সরাতে আমি আসি জয়ন্তী,—না এলে চলেনা তাই আসি !

রঞ্জন—জয়ন্তীকে তুমি চেনো অনন্তদা ?

অনন্ত—চিনি—

রঞ্জন—আমাদের বিয়ের কথা জানতে ?

অনন্ত—[মৃদু হেসে, মাথা নেড়ে] জানতাম রঞ্জন !

রঞ্জন—তুমি সবাইকে চেনো অনন্তদা—সবই জানো !

অনন্ত—[মৃদু হেসে] তোদেরে চিনি,—তোরা যে 'সবাই'র বাইরে পড়িস্ !

জয়ন্তী—কতোদিন তোমার কথা ভেবেছি, যখন এলে হঠাৎ এলে—

অনন্ত—এই যে নিয়ম জয়ন্তী, প্রয়োজন যখন আসে তখন তা' কিছু না জানিয়ে হঠাৎই এসে পড়ে। ঝড় আসে নিজের প্রয়োজনে,—তাকে উপেক্ষা করা চলে না—না বলা চলে না ! [রঞ্জনের দিকে চেয়ে] আমি যে আজ আসবো তা' জানতে না রঞ্জন ?

রঞ্জন—জানতাম !

জয়ন্তী—আমাকে তো কিছু বল নি ?

রঞ্জন—ভেবেছিলুম তোমাকে হঠাৎ চমকিয়ে দেবো !

জয়ন্তী—তা' চমকিয়ে দিলে তো এবার !—

রঞ্জন—আমি ভেবেছিলাম তুমি অনন্তদাকে চেনো না !

জয়ন্তী—চিনি না মানে ? [অনন্তের দিকে চেয়ে] পাঁচ বছর আগে সেই যে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে,—তারপর কতো ভেবেছি তোমার কথা—কতোদিন ভেবেছি তুমি আসবে ! তারপর…

[জয়ন্তী গম্ভীর হয়ে উঠলো, রঞ্জন তার মুখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো ।]

অনন্ত—তোদের যে আমি ভালবাসি জয়ন্তী, তাইতো তোদেরে ফাঁকি দিতে পারিনে !

রঞ্জন—তোমাকে মোটে জানা যায় না অনন্ত দা ! তুমি এতো জানো,—তোমার এতো কাজ,—তুমি এতো সহজ—

[অনন্তের মুখে চেয়ে দেখতে লাগলো বিস্মিত দৃষ্টিমেলে ।]

অনন্ত—তাইতো আমি ফাঁকি দিতে পারিনে ভাই,—নিজেকে ফাঁকি দিয়ে কি চলা যায় ?

জয়ন্তী—চলো অনন্তদা, হাতমুখ ধোবে না ?—ততক্ষণ আমি তোমার ঘর ঠিক করে ফেলবো—

অনন্ত—তাই চলো। [অনন্ত উঠলো, রঞ্জনও উঠে দাঁড়ালো]

[জয়ন্তী আগে ও অনন্ত পাছে পাছে চলে গেল।]

রঞ্জন—[একটু হেঁটে, তার পর দাঁড়িয়ে] সবই বুঝলাম জয়ন্তী সব কিছু আজ পরিষ্কার হয়ে গেল! কিন্তু—[একটু ভেবে] অনন্তদা? ও যে মায়া—আলেয়া জয়ন্তী,—ওর যে কোনদিন নাগাল পাবে না! ও যে বড়, ওকে শুধু পূজা করাই চলে, কিন্তু পাওয়া যায় না—বড় বলেই পাওয়া যায় না।

(দ্রুত দু'তিন বার ঘরের মধ্যে হাঁটিলো, তারপর দাঁড়িয়ে।

জয়ন্তী, তুমি থাকো তোমার এ পূজা নিয়ে, আমিও আমার পূজো নিয়ে এগিয়ে যাই—তাই ভাল! [একটু ভেবে] হয়তো দু'জনের পূজোই ব্যর্থ বিফল হবে—তবু তাই ভাল—

[মুখে তার ম্লান হাসি ফুটে উঠলো।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অনন্তের কক্ষ ;

সময়—রবিবার তিনটার কিছু আগে।

[অনন্ত বসে, সামনে অনেকগুলো কাগজ। কাগজগুলো মনোযোগের সঙ্গে দেখছে। এমন সময় বাইরে পদশব্দ হলো। অনন্ত একটু শুনলো। টেবিলের উপর হতে ছোট ঘড়িটা নিয়ে দেখলো—তারপর কাগজ পত্র ঠেলে রেখে ঠিক হয়ে বসলো।]

অনন্ত—জয়ন্তী আসছে, ও সুখী হতে পারে নি! একি আমার দোষ? কিন্তু কি আমি করতে পারতাম—কিছু না। তাকে সুখী করাও যে আমার কাজ ইচ্ছা করলেই তো আর সব ঝেড়ে ফেলা যায় না (মৃদু হাস্য)। সব কিছুই কি আমি ইচ্ছা করলেই করতে পারি? [একটু চিন্তিত]।

[ঘরে এসে ঢুকলো বিজয়]

বিজয়—(সামনে বসে) অনন্তদা, সব ঠিক আছে, কোন কিছুর ত্রুটি রাখিনি! তোমার মহাবাণী ঘরে ঘরে,—প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। সত্যি—আজ

আমার আনন্দ অনন্তদা, এ যে আমার গৌরব—আমার বিজয়—তোমার সাধনা আজ সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে—

অনন্ত—সে তো সত্যি ভাই, তোকে কি আর চিনিনে—তোর হাতে যে সবই সোনা হয়ে উঠে বিজয় !

বিজয়—আজ মানুষের মুখে ফিরছে চলার মন্ত্র,—কাজ—দুঃখ। কিন্তু ওই দুঃখটাই কি সত্যি অনন্ত দা, মাঝে মাঝে বুঝে উঠতে পারিনে, কেমন যেন সবকিছু গণ্ডগোলে ভরে উঠে—কেমন গোলমালে ভরে যায়—

অনন্ত—ওই দুঃখ যে পেয়েছি ভাই সাধনায়, আর পেয়েছি চলা ! ওই সত্য বিজয়, জগতে আর কোন সত্য নেই। মানুষকে চিন্তা কর ভাই মানুষ হিসাবে, ওখানে সে একা উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে—চলছে—খসে পড়েছে বাইরের মোহ ! মানুষ ভাবে সে বুঝি থেমে গেল—পথকে ঘর করে ভাবে পথকে—চলাকে এড়িয়ে চললো বুঝি। কিন্তু পথ যে ঘর হয় না বিজয়—হতে পারে না ! চেয়ে দেখ ভাই ঘর কি তার এ চলা আটকাতে পেরেছে ? এযে তার অনন্ত যাত্রা, থামতে পারে না। চলা মানেই দুঃখ, থেমেছি—সুখী হয়েছি—ভাবলেই কি সুখী হওয়া যায় ?

[ভাবতে লাগলো]

বিজয়—তবু তো মানুষ তাই ভাবে—

[বিজয় অনন্তের চোখে চেয়ে রইলো]

অনন্ত—এই ভাবাটাই মিথ্যা,—সত্য যে গোপনে বাসা বেঁধে থাকে আমাদের মাঝে! খুঁজলে, হাতড়ে দেখলে দেখতে পাবি সব মিথ্যা,—রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শাসন—সব মিথ্যা—সব বাইরের—সব খোলস। সত্য মানুষ,—সত্য তার চলা—তার দুঃখ। আজো কেউ আমার এ মত আর পথ হয়তো ঠিক বুঝেনি, বুঝেনি এ 'সেবক সঙ্ঘ' গড়ে মানুষকে আমি কোথায় নিয়ে যেতে চাই,—শুধু ছুটেই চলেছে—একদিন ওরা বুঝবে। [হঠাৎ বিজয়ের মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঢেলে] বিজয়, ভাই, তুইতো বুঝিস্ একদিন আমার এ স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠবে,—মিথ্যা খোলস ঝরে পড়বে, মানুষ তার নিজেরই মাঝে ফিরে পাবে তার সত্য—মানুষ মানুষ হবে।

বিজয়—এ যে আমার স্বপ্ন অনন্ত দা, আমি যে আশাবাদী—

অনন্ত—তাইতো তুই কবি—তাই তো তুই পাগল—

বিজয়—আমি যে পাগল হয়েই থাকতে চাই অনন্তদা, এতেই যে আমি সুখী!

অনন্ত—তাই থাক ভাই, আর আমার থাক কাজ আর চলা!

বিজয়—তুমি কি থামবে না অনন্ত দা?

অনন্ত—কেমন করে থামবো বল, আমি যে ভবিষ্যতের রঙীন আলোয় জগৎকে দেখিরে! তুই তো আমাকে বিশ্বাস করিস বিজয়!

বিজয়—একটা কথা বলবে অনন্তদা? কেন তুমি জগৎকে ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াও—কেন এমন করে আড়ালে থাকো নিজেকে গোপন রেখে?

অনন্ত—কাজকে ফাঁকি দিতে পারিনে যে ভাই? তাই তো আড়ালে থাকতে হয়, দিতে হয় জগৎকে ফাঁকি।

বিজয়—[মৃদু হেসে] কি মনে হচ্ছে জানো? তোমার হয়তো আড়ালে থাকা আর চলবে না!

অনন্ত—তাইতো ভাবছি—। সর্বাণী তিনটায় আসছে?

বিজয়—হ্যাঁ—

অনন্ত—দেখ বিজয়, তুই ছাড়া আমাকে আর কেউ জানে না।

বিজয়—না—

অনন্ত—[যেন আপন মনে] জানে না আমার এ কাজ—আমার এ চলা কোন দিনই শেষ হবার নয়।

[ভাবতে লাগলো]।

বিজয়—শেষ হওয়াটা যে সত্য নয় অনন্তদা! সত্যটা বুঝবার ক্ষমতাই যে আজো মানুষের নেই, ওরা যে ছুটে চলেছে বেগে উদ্দেশ্যহীন—কোথায়?

[চোখের দৃষ্টি দূরে]।

অনন্ত—তাই যে ওদেরে পাইয়ে দিতে হবে বিজয়!

বিজয়—পাবে ওরা ? (একটু থেমে, একটু ভেবে) অনন্তদা—

অনন্ত—কি ভাই ?

বিজয়—ওদেরে দেখলে যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি অনন্তদা ?—মানুষ কি ?

অনন্ত—ওদেরে অবিশ্বাস করিসনে ভাই—ওদেরে বিশ্বাস কর ! ওই ওরাই যে আমাদের চলার পথে পুঁজি ভাই। মানুষ আজ অসহায়—বড়ো বেশি অসহায় ওরা ! মনে করে দেখ বিজয়, ওই মানুষই যেদিন জানবে তার অসীম ক্ষমতার কথা সে দিনের রূপটা ! মানুষের ক্ষমতা যে ওই অনন্ত আকাশের সীমাহীন শূন্যের মতো—অন্তহীন সময়ের মতো—আমাদের ধারণায়ই আসে না। বিরাট কি তার বিরাটত্ব অনুভব করে রে ? বিরাটত্ব বুঝবার জিনিষ নয়—ধারণার জিনিষ নয়—ওটা ভিতরেই থাকে। বিশ্বাস হারাসনে ভাই—

বিজয়—তাই হবে অনন্তদা, বিশ্বাস করেই চলবো। (বিজয় অনন্তকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো) অনন্তদা, মাঝে মাঝে ভাবি তুমি কি ?

অনন্ত—আমিও ভাবি বিজয়—তোরি কথা। কি তুই—তোর কি কিছুই চাই না ?—

বিজয়—আমি যে কবি—আমার যে কিছুই চাইতে নেই !

অনন্ত—তাইতো ভাবি। আমি চাই আর তোর চাইনে, এ দুই এর মাঝে মিলও নেই—তফাৎও নেই।

[দু'জন হাসলো।]

[বাহিরে পদ-শব্দ]

অনন্ত—জয়ন্তী আসছে—

বিজয়—এবার আসি তা' হলে—

[উঠে দাঁড়ালো]

অনন্ত—তিনটার পর আসিস্—[আঙুল দিয়ে টেবিলের উপর দেখিয়ে] ওগুলো নিয়ে যা—

[বিজয় টেবিলের একধার হতে কতকগুলো কাগজ নিয়ে চলে গেল। অন্য দিকে এসে জয়ন্তী ঢুকলো।]

অনন্ত—জয়ন্তী, বসো—

[জয়ন্তী এসে অনন্তের পাশের চেয়ারে বসলো, সামনে টেবিলের উপর রাখলো হাত।]

জয়ন্তী—অনন্তদা,—[করুণ]

অনন্ত—কি রে, তোদের 'সেবক সঙ্ঘ' কেমন চলছে জয়ন্তী ?

জয়ন্তী—[করুণ] ভালই চলছে ! পাঁচ বছর তোমার পথ চেয়ে কাটিয়েছি অনন্তদা, কেন তুমি কোন খবরই দাও নি ?

অনন্ত—তুই তো আমাকে জানিস জয়ন্তী, সে কেমন করে সম্ভব বল! কতো কাজ—সারা জগৎজুড়ে কাজ যে আমার অপেক্ষা করে আছে,—থামবার আমার ফুরসৎ কই বল্!

জয়ন্তী—[কণ্ঠে তিরস্কার] সারা জগৎ জুড়ে কাজ অপেক্ষা করে আছে আর আমি অপেক্ষা করে নেই? আমার চেয়ে তোমার কাজই বড় হলো? এ যে তোমারই শিক্ষা অনন্তদা,—মানুষকে মানুষ হবার উপদেশ দাও সত্য কিন্তু তোমরা বুঝতেও চাও না মানুষের চেয়ে তার হৃদয়টা কম সত্য নয়। মানুষের চেয়ে কাজটাই বড় সত্য হল—তোমরা বড় নিষ্ঠুর!

অনন্ত—দায়ী করবি কর, গাল দিবি দে,—কিছুই বলবো না জয়ন্তী! আমি জানতাম আমাদের এ বোঝাপড়া হবেই, আমার যে আজ তোর এ অভিযোগের কোন উত্তর নেই। ওখানে আমার আজ হার হল রে, মস্ত বড় হার, যেমনটি আমার জীবনে আর হয় নি—

জয়ন্তী—আমি যে আর সইতে পারি না অনন্তদা, জীবনটাকে মেনে নিতে পারছিনে আজ, এ দুঃখের কি শেষ হবে না—

অনন্ত—এই জীবন বোন! এই দুঃখই জীবন—এই দুঃখই সত্য, এ নিয়েই মানুষকে মানুষ হ'তে হ'বে।

জয়ন্তী—[এবার যেন ভেঙে পড়্‌লো এমন ভাবে] তুমি কি বুঝবে না অনন্তদা, কিছুতেই বুঝবে না? আমি যে ভয়ানক শ্রান্ত—আমি যে আর পারি নে—

[অনন্ত টেবিলের উপর হতে জয়ন্তীর হাত নিজের মুঠোর ভিতর পুরে নিল, তার মুখে ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগল।]

অনন্ত—বুঝিরে—সবি বুঝি! আমি বলছি জয়ন্তী, তুই সুখী হবি বোন। তোদের বিয়ের খবর আমি পেয়েছি, ভেবেছি এ ভালই হ'ল—রঞ্জনকে আমি জানি—আমি জানি সুখী তুই হবি। জগতে সব কিছুই মানুষের ইচ্ছা মত ঘটে না জয়ন্তী! দুঃখের ভিতর দিয়ে নিজেকে পেতে হয়, জগৎকে পেতে হয়, সত্যকে পেতে হয়।

[একটু থেমে, জয়ন্তীর হাত নিজের দিকে টেনে, আরো ঝুঁকে]

জানিস্ জয়ন্তী, আমিও মানুষ, আমারও দুর্বল মুহূর্ত আসে,—মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, নিজেকে মনে হয় অর্থহীন, জগৎকে মনে হয় অর্থহীন! মনে হয় আমি কি? বিশাল বিশ্ব, যেখানে হাজার হাজার সূর্য অনন্ত কাল বোপে ঘুরে মরছে—সেখানে আমি কতোটুকু? আমাকে তোরা কাট-খোট্টা ভাবিস, মাঝে মাঝে আমি কবি হয়ে উঠি [মৃদু হাসি],

ঘাসের দিকে চেয়ে মনে হয় অনন্ত রহস্যে ভরা, প্রকৃতি তার বৈচিত্রে চমক হানে! মনে রাখিস্ জয়ন্তী আমিও মানুষ—আমার অনন্ত ক্ষুধা—আমার—

[ঠিক এই মুহূর্তে সামনের দরজা দিয়ে এলো সর্বাণী। কথা শুনে আর দু'জনকে এ অবস্থায় দেখে তার চোখে ফুটে উঠলো আহত দৃষ্টি, দু'জনের মুখে চেয়ে দেখলো। কথা থামিয়ে জয়ন্তীর হাত ছেড়ে অনন্ত সর্বাণীর মুখে চেয়ে রইল। জয়ন্তী চকিতে চেয়ে সব বুঝে নিল, কোন ভাবান্তর তার হল না।]

সর্বাণী [এগিয়ে এসে অনন্তের হাতে বন্ধ খাম দিয়ে] মা ওখানা আপনাকে দিতে বলেছিলেন! আচ্ছা, আসি। বাইরে রঞ্জন বাবু আবার অপেক্ষা করছেন, নূতন ব্রীজটার কথা পথে আসতে বললেন কিনা, সেটা নাকি চমৎকার হয়েছে! দেখে আসি, দু'জনে মিলে খুব উপভোগ করা যাবে [মুখে টেনে আনলো তীক্ষ্ণ হাসি] নমস্কার!

[জয়ন্তীর দিকে দৃষ্টি হেনে সর্বাণী বেরিয়ে গেল। অনন্ত নীরবে সর্বাণীর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল।]

অনন্ত—এবার যাও জয়ন্তী।

] জয়ন্তী কিছু না বলে ধীরে বেরিয়ে গেল।]

[অনন্ত খাম ছিঁড়ে কয়েক টুকরা কাগজ বের করে প্রত্যেক টুকরা ভাল করে দেখে মনোযোগ দিয়ে পড়লো। একটু ভাবলো। তার পর কলম কাগজ নিয়ে কি লিখলো, পড়ে দেখে তা' খামে পুরলো। খামখানা ভাল করে বন্ধ করে তার উপর মালিকের নাম ঠিকানা লিখে টেবিলের উপর তা' রাখলো, ঠিক হয়ে বসলো চেয়ারে। ঠিক এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো বিজয়।]

অনন্ত—সব দেখেছো বিজয় ?

[সুরে গম্ভীর আদেশের ধ্বনি]

বিজয়—হ্যাঁ—

অনন্ত—সব ঠিক আছে ?

বিজয়—হ্যাঁ—

অনন্ত—[লিখে রাখা খামখানা উঠে এগিয়ে দিয়ে] ওখানা কাল আটটায় পৌঁছা চাই !

বিজয়—তাই হবে।

অনন্ত—যাও—

[বিজয় বেরিয়ে গেল। অনন্ত বাইরে চেয়ে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো।]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—জগদীশ বাবুর গ্রামের বাড়ী।

সময়—সোমবার সকাল।

[জগদীশ বাবুর চেহারা রুক্ষ, অগোছালো ময়লা বেশ, চেহারায় একটা করুণ ছাপ—চিন্তার, বয়সের! হারু এই মাত্র গুড়গুড়ি এনে রাখলো। জগদীশবাবু বসে গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন অনমনস্ক ভাবে। হারু তার মুখে চেয়ে দেখতে লাগলো। জগদীশ বাবু হাতের নল থামিয়ে হঠাৎ যেন জেগে উঠলেন।]

জগদীশ বাবু—[হারুর মুখে চেয়ে] হারু—

হারু—কি বাবু?—

জগদীশ—এই যে ভাবছি হারু, ভাবছি সহরে যাবো—

(উঠে দাঁড়ালেন।)

হারু—তা হলে তৈরি হয়ে নি!

জগদীশ—আজ কতোদিন সহরে যাইনি মনে পড়ে হারু—

হারু—উনিশ বছর—সে তো অনেক বার শুনেছি বাবু! তাই তো বলি—

জগদীশ—থাম্, আর বলতে হবে না—কেন যাইনি জানিস্?

হারু—জানবো না কেন—সবি আমি জানি বাবু—সবি জানি—
ওই যে চলে এলেন—

জগদীশ—থাম্ তো তুই হারু, ভারি সব-জান্তা হয়েছেন—[একটু থেমে] বলতে পারিস ওই রঞ্জনটা কি করছে ?

হারু—কেমন করে বলবো বাবু ?

জগদীশ—না তোকে দিয়ে কিছু হবে না হারু !

হারু—[ম্লান হাসলো]

জগদীশ—কি করছে সে, এক মাস তার কোন খবর নেই, এতোগুলো চিঠি দিলেম—কোন উত্তরই দিল না। না—যেতেই হবে, ওই রঞ্জনটাই ভাবিয়ে তুললে দেখছি—

হারু তাই বলুন বাবু, সব ঠিক করে নি ?

জগদীশ থাম্‌তো তুই। [একটু ভেবে] আজকালকার স্ত্রীরা একেবারে বদলে গেছে—মোটে আগের মতো নয়—না রে !

হারু—ঠিক বলেছেন বাবু—

জগদীশ—আর আজকালকার স্বামী ও বদলে গেছে—

হারু সাচ্চা !

জগদীশ বা [একটু ভেবে] আচ্ছা—বৌমাকে তোর মনে পড়ে হারু ?

হারু—[উচ্ছ্বসিত] পড়বে না বাবু, মা লক্ষ্মী

জগদীশ—[বিরক্ত] থামতো হারু—ওই তোর দোষ—

হারু—[হাস্য] সত্যি বাবু—

জগদীশ—[একটু থেমে] মেয়েটাকে তোর মনে পড়ে রে—

হারু—পড়ে বাবু, [হাত দিয়ে দেখিয়ে] এই এতোটুকুন—টুকটুকে রঙ—কী সুন্দর ! খিলখিল করে হাসতো—

[হারু থেমে গেল ॥]

জগদীশ—বলতে পারিস হারু তার বয়স এখন কতো হয়েছে ?—

হারু—[আঙুলে গণে] তখন ছিল এক বছরের আর উনিশ বছর, এই হলো কুড়ি—

জগদীশ—থাম্, আব হিসেব করতে হবে না—[একটু থেমে] দেখতে তার মাব মত হয়েছে—কি বলিস ?

হারু—তা আর হবে না—মা ছিলেন স—

জগদীশ—[অধৈর্যে] হযেছে থাম্—[একটু ভেবে] আচ্ছা হারু, তুই তো আমাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছিস. আমি কোন অন্যায় করতে পারি ?

হারু—[নীরবে তাকিয়ে রইলো]—

জগদীশ—না হয় রাগের মাথায় একটা কথা বলেই ছিলুম, তার কি ক্ষমা নেই হারু !

হারু--[তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো।]

জগদীশ—[কণ্ঠে ক্ষুব্ধ অভিমান] আর আমারই যেন রাগ করতে নেই—অভিমান করতে নেই—

(সামনে তাকিয়ে বইলেন)।

হারু—ওকথা থাক বাবু—[কণ্ঠে মিনতিভরা বারণ]

জগদীশ বাবু—[একটু বাইরে চেয়ে, একটু ভেবে] না হারু—
এ আমারই তো দোষ! আমিই তো তাকে বুঝতে পারিনি! ও বড় অভিমানী ছিল—না রে!

হারু—[মুখে হাসি ফুটে উঠলো] সত্যি বাবু, বড্ড ভাল ছিলেন। এতোবড়—এতো—

জগদীশ—থাম তুই। [একটু ভেবে, একটু পরে] ওরা চলে গেল—আমার স্ত্রী আমার মেয়ে! তারপর—তারপর আমার কেমন করে কাটলো ফিরেও দেখলো না। আমার কি কিছুই নালিশ জানাবার নেই [কণ্ঠে অভিমান] জানিস হারু আমার দিনগুলো কেমন করে কেটেছে—?

হারু— সে তো দেখতেই পাচ্ছি বাবু—[কণ্ঠে বেদনা মাখা]

জগদীশ—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) উনিশ বছর তারা চলে গেছে,—আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে!—(হারু তার মুখে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো, জগদীশ বাবু আপন মনে বলে যেতে লাগলেন) অভিমানে অন্ধ হয়ে রইলেম। ভাবলাম ফিরে আসবে—দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো। তারপর···(হারুর মুখে চেয়ে)—জানিস হারু,—তারপর দিন আমার কেমন করে কেটেছে। পাপ যে আমার, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না? এ আমারই দোষ হারু! মনে হয়েছে, এ কি আমি করলাম, কেমন করে আমি করলাম

হারু? হ্যাঁ মিছিমিছি তাদেরে তাড়িয়ে দিয়েছি—সে যে আমার পাপের ফল ধরেছে হারু—বুঝবি না তুই বুঝবি না রে! আমি উনিশ বছর খোঁজ করেছি—কতো বনে বনে কতো স্থানে—পাহাড়,—দিনের পর দিন চলে গেছে

(দৃষ্টিতে তার উন্মাদ আবেগ ফুটে উঠলো)।

হারু দাঁড়িয়ে বাবু বাবু আপনি একবার শুনুন—আপনি তো কিছুই শুনবেন না। [স্বরে কাকুতি ঢেলে] চলুন না, আমরা দু'জনে যাই—খুঁজে বের করি—

জগদীশ বাবু—[হারুর মুখে দৃষ্টি ঢেলে] পাবি খুঁজে বের করতে পারবি হারু? আমি আজ উনিশ বছর যা পাইনি তা তুই পাবি? আমার মেয়ে—এক বছরের মেয়ে আমার—[বাইরে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, তার পর হারুর মুখে চোখ ফিরিয়ে] আমার কি মনে হয় জানিস হারু—আমার মনে হয় ওরা আর নেই, ওদেরে আর পাবনা—পাবনারে—[স্বরে ক্রন্দনের চমৎকার আবেগ বেদনাময়]! কতো কষ্ট ওরা পেয়েছে কে জানে!—আমার এ কষ্ট তুই বুঝতে পারবিনে হারু! এযে আমার কতো বড় পাপ, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না? তাই তো করে যাচ্ছি—করে যাচ্ছি—[একটু থেমে মৃদুস্বরে, মাথা ঝুঁকিয়ে, চোখে মুখে টানা ভঙ্গি এনে] মাঝে মনে হয় হারু

ওরা আছে—আবার ওদের আমি ফিরে পাবো—
ফিরে পাবো—মেয়ে আমার—

[জগদীশ বাবু চোখ মুছলেন।]

বাইরে পিওন হাঁকলো—চিঠি—

[হারু গিয়ে চিঠি নিয়ে এলো]

হারু—চিঠি বাবু—

[জগদীশ বাবু তার হাত হতে চিঠি নিয়ে পড়তে লাগলেন—দু'তিন বার পড়ে অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন।]

জগদীশবাবু—ওরা আছে—পাবো—আজ চারটায়—চিঠিতে নাম নেই—[জোরে চীৎকার করে বললেন]—হারু, সব ঠিক করে নে—আজ চারটে—সময় নেই—ষ্টেশনে যেতে হবে—সহরে যাবো—

[ঘড়ি দেখলেন।]

(যবনিকা)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রঞ্জনের বাহিরের ঘর।

সময়—বিকাল চারটার কিছু বাকি—

বিজয়—আমার নূতন গানখানা শিখেছো জয়ন্তীদি—

জয়ন্তী—[সস্নেহে বিজয়ের দিকে চেয়ে] হ্যাঁ—

বিজয়—[আগ্রহে] গাও না ভাই—

জয়ন্তী—একি গান গাবার সময় রে—

বিজয়—গানের সময় যে মনে, আসলে তুমি ওখানা শেখোনি—

জয়ন্তী—[মৃদু হেসে] আচ্ছা দেখি—

[অর্গেনের সামনে বসে সুর দিল]।

জয়ন্তী—[ভুল সুরে গাইতে লাগলো]

জ্বালো মম মানস খধূপে

আসো নিত্য নব নব রূপে।

বিজয়—[মাথা নেড়ে] হল না, ভুল করলে জয়ন্তীদি, আমার গান কি এতোই খেলো। আচ্ছা শোন—

[বিজয় গাইতে লাগলো, জয়ন্তী মনোযোগ দিয়ে শোনলো, তারপর আবার অর্গেনে সুর দিলো]।

জয়ন্তী—[গাইতে লাগলো]

জ্বালো মম মানস ধূপে
আসো নিত্য নব নব রূপে।
মৃদু ঝঙ্কারো মম মন-তারে
তব চঞ্চল সুর-ঝঙ্কারে।
মম চিত্তে উঠুক দুলি' মন্দ
আজি সুর নন্দিত তব ছন্দ।
তুমি দক্ষিণ সমীরণে আসো—
মম অন্তরে আসো চুপে চুপে।
আসো নিত্য নব নব রূপে।

[রঞ্জন ও সর্বাণী এসে ঘরে ঢুকলো। চেয়ারে বসলো। জয়ন্তী গান গেয়ে চললো—]

তব সঞ্চিত রক্ত-পরাগে
মম অন্তর কিশলয় জাগে!
সুখ সুরভিত বল্লী-বিতানে
নব পল্লবে কথা কাণে কাণে!
মম যৌবন-অনুরাগে আসো—
মম আনন্দে আসো চুপে চুপে।
আসো নিত্য নব নব রূপে।

(জয়ন্তী যেমন ছিল তেমনি রইলো)

বিজয়—[মুগ্ধ কণ্ঠে] এতো সুন্দর তুমি গাইতে পার ! তোমার সুরে যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠে আমার কথা--আমি যে এতো ভাল লিখতে পারি তুমি না গাইলে সেটা বুঝাই যায় না। আমার মনে হয়, [সর্বাণীর দিকে চেয়ে] ওই সর্বাণী যে বলে আমার এসব কিছুই হয় না—হয়তো তাই—হয়তো আমি লিখতেই পারি না ! সর্বাণীটা কিছুই বুঝে না—একেবারে বোকা—

সর্বাণী—(কৌতুকে) এ কিন্তু তোমার অন্যায় বিজয়দা,—এক ঘর লোকের সামনে আমাকে এ ভাবে তোমার বলা---

(সবাই হাসলো)

রঞ্জন— [বিজয়ের দিকে চেয়ে] তোমার একটা কথা কিন্তু ঠিক নয় বিজয়, ওখানে জয়ন্তীর সঙ্গে সর্বাণীর কোন মিলই নেই সেদিন কত বললাম, কতো পীড়াপীড়ি করলাম--কিছুতেই সে গাইলো না · ·

(জয়ন্তী ওদের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো) ।

বিজয়—[সর্বাণীর দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি ফেলে] এ তুমি বুঝবে না রঞ্জনদা, গান ওর পেটে পেটে— অবশ্য গান মানে যদি দুষ্ট বুদ্ধি হয়—

সর্বাণী—বুদ্ধি যে মাথায় থাকে বিজয়দা !

বিজয়—জানিস্, তোদের মাথায় কিছুই নেই --

('কিছুই' শব্দে জোর দিয়ে

সর্বাণী—বকছো!

বিজয়—থাম্ সর্বাণী। আচ্ছা তোর বুদ্ধি আছে,—না?

সর্বাণী—[বিজয় কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে] হ্যাঁ!

বিজয়—ভাল বুদ্ধি মাথায় খেলে—

সর্বাণী—হ্যাঁ,—[বুঝতে না পেরে বিজয়ের মুখে চেয়ে]।

বিজয়—আর মাথায় তোর কিছুই নেই—

সর্বাণী—[কৌতুকে] ওটাও আমাকে মানতে হবে?

বিজয়—[ধমক দিয়ে] মানবি না তো কি! তুই একেবারে বোকা—এতো জলের মতো স্পষ্ট।

সর্বাণী—[ক্ষুব্ধ] ওই আবার বকতে সুরু করলে,—

বিজয় [বাধা দিয়ে] থাম সর্বাণী! তোর মাথায় কিছু নেই—অথচ বুদ্ধি আছে,—[একটু ভেবে, কপাল কুচকে, মাথা নেড়ে] মাথায় ভাল বুদ্ধি থাকে। তা'হলে তোর বুদ্ধিটা কোথায় আছে জানিস?

সর্বাণী—[কৌতুকে মাথা নেড়ে] না তো—

বিজয়—ওই লোকে বলে না 'পেটে পেটে বুদ্ধি,' তোর বুদ্ধিটারও থাকবার তো একটা জায়গা চাই, বেচারা মাথায় ঢুকতে না পেরে আশ্রয় নিয়েছে তোর পেটে। কিন্তু ওখানে তো ভাল বুদ্ধি থাকে না—[মাথা নাড়লো, বিজ্ঞভাবে]!

সর্বাণী—[মৃদুহেসে] এযে ন্যায় শাস্ত্র গড়ে তুললে বিজয়দা !

বিজয়—[কৃত্রিম গর্বে] ন্যায় শাস্ত্র—হুঁ—[মাথা নেড়ে] ন্যায়শাস্ত্র তো আমরাই গড়ি ! আরো কতো কিছু গড়তে পারতাম—শুধু তোরা কিছু বুঝবিনে তাই বাদ দিয়েছি—[হতাশ মুখ ভঙ্গি] কি করবো গড়ে ! [সবাই এবার মৃদু হাসছে, বিজয় বলে যেতে লাগলো] এসব তো তোদেরই জন্য আমার গড়া—আর তোরা বুদ্ধিটাকে পেটে পুরে দিব্যি আছিস ! কার জন্য গড়বো বল—[বিজয়ের মুখভাব এমন হতাশ হয়ে উঠলো যে সবাই উঠলো জোরে হেসে]।

(একটু সময় কাটলো চুপ চাপ)

সর্বাণী— কিন্তু বিজয়দা, তোমার আরেকটি কথা মোটে সত্য নয়। এতো মিথ্যাও তুমি বলতে পারো !—[হেসে রঞ্জনের দিকে চেয়ে দেখলো]

বিজয়—কি বললি, আমি মিছে কথা বলি ?

সর্বাণী—ওই রঞ্জন বাবুটি খুব ভাল—তুমি বললে। ওটি কিন্তু ঠিক নয়—[মাথা নাড়লো]।

(সর্বাণী চেয়ে দেখলো জয়ন্তীর দিকে। রঞ্জন আর বিজয় চাইল সর্বাণীর মুখে, দু'জনই যেন বুঝতে চায় ! জয়ন্তী পরিবর্তন হীন)।

রঞ্জন [সর্বাণীকে] মানে ?

সর্বাণী—[বিজয়কে] কাল যা এর পরিচয় পেয়েছি, শোনবে ? কাল বিকেল বেলা ব্রীজ দেখতে যাবার কথা ছিল না ?—যা পাগলামী সুরু করলেন-

(জয়ন্তী এবার চকিতে চেয়ে দেখলো রঞ্জনের মুখে, জয়ন্তীর মুখ ভাবলেশ হীন। রঞ্জন অন্যদিকে চোখ ফেরালো।)

বিজয়—[সর্বাণীকে, সুরে তিরস্কার] তুই একেবারে বোকা—মস্তবড় বোকা ! সেটা হয়েছে তোরই ছোঁয়াচ লেগে,—রঞ্জনদাকে আমি চিনি !

রঞ্জন—[সুরে অস্বস্তি] সে আমি না তুমি ? তুমিই তো বললে,—চলুন ব্রীজটা দেখে আসি,—মাঝ পথ থেকে বাড়ী চলে গেলে। তারপর কী পাগলামী,—কোন মতেই আর বেরোবে না ! কতো কয়ে তবে—বাবা—এতো সাধাসাধি ! জানো জয়ন্তীকে এতো বলতে হত না ; অবশ্য তাতে যে তাকে বুঝাটা সহজ হত এমন বলছিনে আমি—

সর্বাণী—[অর্থপূর্ণ দৃষ্টি] আর আপনার পাগলামী ?

(সর্বাণী হাসি ভরা বাঁকা চোখে চেয়ে দেখলো জয়ন্তীর মুখে। রঞ্জন তাড়াতাড়ি কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বললো জয়ন্তী।)

জয়ন্তী—[বিজয়কে] তুই একটা কথা ঠিকই বলেছিলি বিজয়, সত্যি সর্বাণী সুন্দর আর একেবারে ছেলে মানুষ !

বিজয়—[সর্বাণীকে মৃদু হেসে] কি রে, ছোট হয়ে গেলি, অহঙ্কারটা ভাঙলো ? ইচ্ছা করলেই বড় হওয়া যায় না বোন, দুঃখ করিসনে, ছোট হতে পাওয়াও যে পুণ্য রে ! [রঞ্জনকে] রঞ্জনদা, তোমরা বুঝলে না জয়ন্তীদিকে,—[সর্বাণীর দিকে চোখ ফিরিয়ে] ও জেগে আছে, ও খুব ভাল—

[ঠিক এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো অনন্ত, ঘরের আবহাওয়া বদলে গেল ! গতির অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো দ্রুততায়। তার মাঝে এক দিকে চুপ করে বসে বিজয়, যেন যোগসূত্র হীন, খাপ ছাড়া,—অস্বাভাবিক । আর সবারই দৃষ্টি অনন্তের মুখে। অনন্ত এসে মাঝ খানে দাঁড়ালো।]

অনন্ত—রঞ্জন, আমার যাবার সময় যে হয়ে এলো,—আমাকে যে যেতে হবে ভাই !

রঞ্জন—সে কি অনন্তদা, আজই যাবে !

জয়ন্তী—চলে যাবে অনন্তদা !

অনন্ত—হ্যাঁ বোন ! আমি যে প্রয়োজনেই আসি, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে যে আমার আর থাকতে নেই—আমাকে

চলে যেতে হয়। রয়েছে চলা—রয়েছে সীমাহীন পথ —প্রয়োজন যে ফুরিয়ে এসেছে···

জয়ন্তী—এতো তাড়াতাড়ি তা শেষ হয়ে এলো অনন্তদা!

অনন্ত— শেষ হয়ে এলো রে! নূতন প্রয়োজন যে আমার অপেক্ষা করে—থামবো কেমন করে বল! আলোর দিশারী—আলো ফুটিয়ে ভুলতে হবে না? [ভাবতে লাগলো]। বুড়ো সংস্কার পথে দাঁড়িয়ে, স্নেহের বাঁধনে ধরে রাখতে চায়! স্নেহের চিতায় এগিয়ে চলার ছন্দ বাজে,—চলা থামে না। [মাথা নাড়লো।]

[ঠিক এমন সময় এলেন জগদীশ বাবু।]

রঞ্জন—[বিস্মিত] বাবা! এ যে বিশ্বাস করতে পারছি না।

[সবাই উঠে দাঁড়ালো। রঞ্জন ও জয়ন্তী তাকে প্রণাম করলো, সর্বাণী দেখতে লাগলো। বিজয়ের কোন সাড়া নেই, বসে। তীক্ষ্ণ চোখে অনন্ত চেয়ে রইলো জগদীশবাবুর মুখে।]

[জগদীশবাবু এগিয়ে এসে অনন্তের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, ভাল করে অনন্তকে দেখতে লাগলেন।]

জগদীশবাবু—সজ্ঞ দত্ত—তুমি!

[এক সঙ্গে সবার বিস্মিত দৃষ্টি ছুটে এলো অনন্তের মুখে।]

জয়ন্তী—তুমি—তুমি অনন্তদা !

রঞ্জন—তুমিই সত্য দও ! সারা জগতের বিস্ময়—কেউ জানে না !

অনন্ত—চুপ্—চুপ্ ! তাই তো জানতুম ভাই,—জানতুম কেউ আমাকে জানে না ওই বিজয় ছাড়া [বিজয়কে দেখিয়ে] । সব জানাতেই গলদ থাকে রে—বাকি রয়ে যায়। এই তো সত্য—এ আজ জানলুম !

বিজয়—আজ চারটেয় যে তাঁর আবির্ভাব !···

[সবাই বিজয়ের দিকে চাইলো, বিজয় বাইরে তাকিয়ে বসে, সাড়া-হীন।]

জগদীশবাবু—[অনন্তকে] আজ উনিশ বছর পরে ?

[সবার বিস্মিত দৃষ্টি তাদের মুখে।]

অনন্ত—সেই দশবছর বয়সে যে বোঝা তুলে নিয়েছিলুম তাই যে আজো বয়ে চলেছি জগদীশ বাবু ? আমিই আপনাকে চিঠি দিয়েছি। অদ্ভুত আপনার স্মরণ শক্তি, আমাকে তো একবারের বেশি দেখেন নি—তাও কতো ছোট ছিলাম !

জগদীশ—ইন্দিরা কই ?

অনন্ত—নেই !—

জগদীশবাবু—নেই—নেই সে—! সর্বাণী ? আমার মেয়ে ?

অনন্ত— [সর্বাণীকে] সর্বাণী, বাবাকে প্রণাম কর !

সর্বাণী— [জগদীশ বাবুর কাছে এগিয়ে এসে]—বাবা—[বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।]

জগদীশবাবু—মা—মা—[বুকে জড়িয়ে ধরলেন, জয়ন্তীর মুখ তার বাঁ কাঁধে, স্নেহে তার গায়ে, মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন।]

[বিস্মিত রঞ্জন ও জয়ন্তীর দিকে এগিয়ে গেল অনন্ত।]

অনন্ত—রঞ্জন !

রঞ্জন—কি অনন্তদা—

অনন্ত—মনে পড়ে কেমন করে জয়ন্তীকে তুই প্রথম দেখেছিলি ?

রঞ্জন—[বিস্ময়] সে তুমি কেমন করে জানলে অনন্তদা ! আজ যে কিছুই বিশ্বাস হচ্ছে না, এ যেন ভোজবাজি ! এ কি দেখছি অনন্তদা ?—এ কি সত্য—আভিনয় নয় ?

অনন্ত— এই জীবন ভাই ! জীবনটাই যে সব চেয়ে বড় অভিনয় —যাদুকর যে অলক্ষ্যে বসে ! ভিতরটা আরো মজার, দেখলে দেখবি কতো বড় আশ্চর্য সেখানে নিত্য ঘটছে। [জয়ন্তীর দিকে সস্নেহ দৃষ্টি ঢেলে] জয়ন্তী ?

জয়ন্তী—অনন্তদা !—

অনন্ত—তোরা সুখী হবি বোন, রঞ্জনকে আমি চিনি রে ! [রঞ্জনের দিকে চেয়ে] তোদের এ বিয়েটা আমিই ঘটিয়েছি রঞ্জন, জয়ন্তী খুব ভাল মেয়ে—তোরা সুখী

হবি এ আমার আশীর্বাদ! [দু'জনে নুয়ে তাকে প্রণাম করলো, অনন্ত একটু থেমে বলতে লাগলো] আমার কাজ শেষ হয়ে এসেছে, যাবার সময় হয়ে এলো—আর যে থাকতে পারি নে।

[অনন্ত এসে মাঝখানে দাঁড়ালো, মুহূর্তে সে বদলে গেল, দেখা দিল কঠোর পুরুষ—গম্ভীর।]

অনন্ত—[সুরে আদেশ] এসো সর্বাণী, রঞ্জনকে প্রণাম কর—তোমার দাদা।

[সর্বাণী ফিরে তাকালো, এসে রঞ্জনকে প্রণাম করলো।]

রঞ্জন—সর্বাণী—দিদি—বোন—[হাত ধরে তুললো]।

অনন্ত— চল সর্বাণী, আমার যে আর সময় নেই।

সর্বাণী—[জগদীশ বাবুর মুখে তাকালো, সুরে ফুটে উঠলো আবেগ] বাবা—

[জগদীশ বাবুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো]

জগদীশবাবু—আয় মা—আয়—[বুকে জড়িয়ে ধরলেন]। এ যে বাবার বুক—হাহাকার ভরা—

অনন্ত—সময় নেই, চল সর্বাণী,—এ তোমার মার আদেশ।

[সর্বাণী জগদীশ বাবুর বাহু বন্ধন মুক্ত করে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো অনন্তের পাশে]

জগদীশবাবু—[সর্বাণীর মুখে চেয়ে রইলেন, মাথা নাড়লেন] না, বাবার বুকে স্থান হল না, ধরে রাখবার জোর আজ নেই [চীৎকার করে উঠলেন] ইন্দিরা—মরবার সময়ও আমাকে ক্ষমা করতে পারলে না ইন্দিরা—[ভেঙে পড়লেন] !

যবনিকা পড়লো।